যাদুকরী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জন-চারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সাঁথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল-পঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্তপ্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে-বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরনে সৌখীন-পাড় শাড়ি, হাতে এক হাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্‌টির চুড়ি, গলায় গিল্‌টির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ি, এখন পরে গিল্‌টির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষাসংগ্রহের পাত্র, সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর : নাচও তাই—বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রুপো দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শক চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না ; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না ; দল দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জেগিন্নী তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়া ছিল কন্যা রমা, বিষণ্ণ নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর তো, পুজো এলো আর এই হ'ল বাজীকরের আমদানি।

—নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরন কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে!

—বালাই! ষাট! শত্তুর মনের সুখ থাক। আপনকার দুঃখ কিসের—

—বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুইই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরন।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হ'ল ঠাকরন? কোথা হ'ল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ'।

—ওরে বাপ রে। তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি। দিদি ঠাকরনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, গয়না নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারূপো বাতিল হ'ল কাঁদছে বসে স্যাকরানী
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজীকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুল ঢুল করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্তীরি—শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা' তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘরবাড়ি,
নয়তো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের
নোনা পানি।
উরর-জাগ-জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ!

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরন। রমা দিদি, চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড় গয়না লিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল? চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম ক'রে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোন কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বরকে লিয়ে আসব —নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রমা দিদির দরবারে।

—মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার 'র‍্যাল ভাড়া' লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া নাকি?

—ঢং করছে! কিছু জানিস না নাকি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জে বাড়ির দেবুকে জানিস?

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—লল্‌ছা'পারা বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মা গ! আমি কুথা যাব গ! মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—বুঝল ঠাকরন, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতম ই লক্ষ্মী ঠাকরনটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জেগিন্নী বললেন—থাম্ বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিস নে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা? মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের পানে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে। না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

... ...

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে-কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সংগতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি. এ. পাস করিয়া এম. এ. পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা মূলা হইতে রান্না-করা তরকারি পর্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে—তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারি উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদই চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্নে মুখুজ্জেবাড়ির ঝি

আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন রিকসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—দেবু বাড়ি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে! বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝি-টা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না! রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলিপথে-পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জেবাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই গো দেবুর মা! দেবুর আজ নেমন্তন্ন ওবাড়িতে। শ্বশুর পাঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে-দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও বাড়িতেই আজ থাকবে, কাল সকালে আসবে।

বাড়ুজ্জেগিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হ'লে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা ব'লে যাও।

—সে কি!

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন—দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন—ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আর্জি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন। ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে-কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্য মহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে-কর্তা আজীবন মাস্টারি করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার, ভাঙামূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন

না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জেগিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরন? বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি!

—হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল!

তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে নাই ঠাকরন!

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না কেন?

—রাগ ক'র নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরন। আমার ওষুধ লিতে হলে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরন; পরিষ্কারের অনেক কারণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ বিন্যেস করতে হবে, ঢলকো ক'রে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা, গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। দেখ, পার তো এলাচ আন আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ, মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা, খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী, সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

... ...

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেলকি লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপটুপিয়ে—! বাহা রে বেটা—বাহা রে!—

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস—ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জ্বলছে পেট, ঘুর‍্যা পড়ছে মাথা। প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জেবল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাঁক পেঁকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই! সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতেই দেখা গেল কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দিয়ে সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না! বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুনী! এই! থানার বারান্দায় বসিয়া ছিল কয়েকজন পুলিস কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ছিল। জনকয়েক বসিযা ছিল বারান্দায। একজন ডাকিল —এই বাজকরুনী! এই!

বাজীকরী আসিয়া কাঁখালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়দারোগা ও ছোটদারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাকীর জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপুনি ই-খান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, নতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর‍্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপ রে!

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উরু-রু জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—
সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—
গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয় না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বল, কি বলছ!

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিসের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি!

কনস্টেবলটিও হাসিল।

বাজীকরী তাহার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনস্টেবল তাহার মুখের দিকে চাহিল,—মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটের রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদু-স্বরে সঙ্গীত—

হায় রে মরি গলায় দড়ি

তুমি হরি লাজ দিবা,
হায় রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা।
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায় রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা।
উরু-রু জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—

আগন্তুক কন্‌স্টেবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস লাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল লয়।

—কেন?

—বল না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।

... ...

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল আকাশে মধ্যাহ্নভাস্কর ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের সূর্য প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগতবর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে সেই বাজীকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ'ল মা ঠাকরন? বাবুদের সেবা হ'ল? পড়ল পাতার এ'টোকাঁটা?

বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—ব'স্ ব'স্, চে'চাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন!

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটির মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ!

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যাঁলা বাজকরুনী গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ, মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে-কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজীকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধুলা।

—হুঁ। সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তর-তন্তর ওষুদপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বার বার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপ রে! দেবতা আমাদের! ভগবান আমাদের! এখনও জমি খাই, দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজা নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস্? সীথল গাঁ নয়—সিন্ধল, সিন্ধল!

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—বলি হ্যাঁগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিন্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন—তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব!

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম 'সিন্ধল', ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট। সে বলিল—কর্তাবাবু—আপনি এত কি কর্যা জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজে চোখে দেখেছে।

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে; সিন্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

... ...

অপরাহ্ণেরও শেষভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোন প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক। মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও-কথা বলিলেও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁখালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো? গান! নাচন দেখ। নাচন! মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ। মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি?

—উপরে মানুষটি কে?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাশ হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার দুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

—এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা ক'রে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা, তুমরা চেঁচাও সাপ-সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়া চল্যা যাই, পুলিসের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজীকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।...

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ির তত্ত্বতল্লাসের জিনিস-পত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে-বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূকে আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে-গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাই-য়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপ রে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন। মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে-গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ি পরিয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত —সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্বনাশ বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখে-শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

—আফিং যদি না খেতে চাইবে তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুনী ভাগ্যে দেখেছিল! ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী! ওরা কারা, জান? আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলা দেশেই বা ক'জনে জানে! শোনঃ

"রাঢ়ের সিন্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্প-বিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে-দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ

করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—"

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন, শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ্ কাটিয়া বলিলেন, ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা!

* * *

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল—চললম লাগর! এইবার চল্যা যাও সোজা!

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বার বার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল—সে ডাকিল—শোন্!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে-অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।